ড. হারুন রশীদ

গারো নৃগোষ্ঠীর নাট্যমূলক নৃত্য

হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে খ্রিষ্টপূর্ব কালেই প্রথমে উত্তরে অগ্রসর হয়ে পরে ভারতের উপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবেশের মুহূর্তে একদিকে বগুড়া জেলা অন্যদিকে ময়মনসিংহের উপর দিয়ে প্রবাহিত এই নদ। এর একটি শাখা বাহাদুরাবাদ ঘাট থেকে বগুড়ার বাঙালি নদী ও করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে সিরাজগঞ্জের কাছে পদ্মার সঙ্গে একত্রিত হয়ে যমুনা নাম ধারণ করে অপর শাখাটি ময়মনসিংহের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

নৃগোষ্ঠী

যমুনার পূর্বতীর ধরে মধুপুরের অরণ্যভূমি থেকে উত্তরে গারো পাহাড় পূর্বদিকে সিলেট জেলার পশ্চিমে বিস্তৃত হাওড় অঞ্চল ও সুরমা কুশিয়ারা নদীর পূর্ব তীরের নিম্নভূমি ময়মনসিংহ নামে প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত। এই জেলা একই সাথে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং নৃতাত্ত্বিক কৌতূহল উদ্রেককারী ভৌগোলিক এলাকা। এতে রয়েছে ছোট ছোট টিলা, সবুজ অরণ্য, সীমাহীন জলরাশি আর লাল মাটিবিশিষ্ট বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সমতলে দো-আঁশ বেলে দো-আঁশ মাটির দ্বারা গঠিত উর্বর ভূমি। বৈচিত্র্যপূর্ণ এর প্রাকৃতিক গড়ন। ভৌগোলিক গঠন বিচারে নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত ছাই বর্ণের বেলে দো-আঁশ মাটি ও লাল বর্ণের এঁটেল মাটি দ্বারা এর মৃত্তিকা গঠিত। নদী বিল ঝিল হাওর জলজ প্রাণীর জন্য যেমন স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ সৃজন করেছে তেমনি বিচিত্র বৃক্ষ শোভিত মধুপুরের গড় সহস্র বছর ধরে বন্যপ্রাণী ও মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছে বসবাস উপযোগী পরিবেশ। প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্য এখানকার অধিবাসীদের জীবনে আনন্দ আর সুরের ঐকতান সৃষ্টি করেছে।

অরণ্যসঙ্কুল নাতি উচ্চ গারো পাহাড় টিয়া, ঘুঘু, হরিয়াল ও বনমোরগের সুমধুর ডাকে মুখর হয়ে ওঠে। লাল-মাটির অরণ্যতুল্য বনে শাল্মলী বৃক্ষের সারি পাখ-পাখালি আর জীব-জন্তুর নিরাপদ আবাস রচনা করে। এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থা অধিবাসীদের মধ্যে মানস গঠনের সহায়ক। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের প্রভাবে এই অঞ্চলের মানুষ স্বভাবতই রোমান্টিক। স্বপ্ন-কল্পনায় বিভোর অথচ গার্হস্থ্য জীবনে বাস্তবতাকে বরণ করতে সাহসী—আবেগপ্রবণ এবং একনিষ্ঠ। শ্রম, প্রেম, আনন্দ জীবনের নিত্যসঙ্গী। প্রেমে আছে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা। জারি, সারি, আর বাউল ভাটিয়ালির বিবাগী সুর জনজীবনকে ভাব জগতের অফুরন্ত মাধুর্য দেয়। ব্রহ্মপুত্র, সোমেশ্বরী, কংস নদীর খরস্রোতে পা ধুয়ে কখনো মৎস্য শিকার করে ঘরে ফেরে গারো নারী পুরুষ। গারো পাহাড় নিবাসী গারোগণ যৌথশ্রমে বিশ্বাসী। পাহাড়ের ঋজুতা সমতলের কোমল নরম পরিবেশের স্পষ্ট প্রভাব সে জীবনের প্রাত্যহিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে নিত্য বহমান। কোমল-কঠোর স্বভাব তাদের। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর এসব মানুষের মনে কোনো কুটিলতা নেই।

সংখ্যালঘুতার কারণে প্রতারিত ও বঞ্চিত জীবনের ভার বইতে বইতে গুটিয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে। কখনো বা বিসর্জন দিয়েছে আত্মপরিচয়, নাম, গোত্র এমনকি ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত। অধিকার বঞ্চিত এসব নৃ-গোষ্ঠী বর্ণহীন বলেই তাদের জীবনের সুমহান বাণী লিপিবদ্ধ হয়নি মাতৃভাষায়। তাইতো তারা আজ বিলুপ্তির চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। কিন্তু লিখিত বর্ণমালা না থাকা সত্ত্বেও নিসর্গকেন্দ্রিক জীবনে তাদের উৎসব, পার্বণ, নৃত্য, গীতিনাট্য, গীতিকা, পালা ইত্যাদি শিল্প এবং নানা রকম ক্রীড়া কসরৎ ইত্যাদি গড়ে ওঠে জুমকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। ঘন-গম্ভীর শালবনের পাতায় পাতায় ঠোঁটের স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলিয়ে শিশু-রোদের কণা ছড়িয়ে পড়তো জুমচাষে নিরতা গারো রমণীর বাদামী অথবা শ্যামলা কালো গ্রীবার পরে। শ্রমক্লান্ত স্বেদসিক্ত, প্রাকৃত সুন্দরী তার ছোট ছোট চোখে সেই সদাহাস্য রৌদ্রকণার দিকে তাকিয়ে সংযুক্ত দুই কর কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানাতো তার ফসলের দেবতা 'সালজংকে'। ঐশ্বর্যময় জীবন ছিলো এক কালে— ইতিহাসের পাতায় খতিয়ান রয়েছে তার। সুসং দুর্গাপুরে গারো রাজপুরুষদের শাসন অব্যাহত ছিলো মধ্যযুগে। গারো জীবনে তখন সোমেশ্বরীর কলরোল, বেগ ও আবেগ শক্তিতে সমুজ্জ্বল। মধুপুর থেকে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি ভাওয়ালের গড় পর্যন্ত আপন আধিপত্য ও গৌরবে উন্নত শির। এই ভূভাগ সমতল এটেল ও দো-আঁশ মাটির সংমিশ্রণে গঠিত সমতল অরণ্যভূমির গর্ভে বাস করে গারো নৃ-গোষ্ঠীর লোকজন। সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এই গারো নৃ-গোষ্ঠীর জীবনে রয়েছে বিভিন্ন পালা-পার্বণ।

পালার মতো গারোদের নৃত্যও নাট্যমূলক। নাট্যমূলক অর্থাৎ এতে খুবই ক্ষুদ্র পরিসরের একটা আখ্যানাংশ রয়েছে। আখ্যানে প্রত্যাশানুরূপ একটা

দ্বন্দ্বেরও ইঙ্গিত বর্তমান। দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে থাকে নাটকের পক্ষ প্রতিপক্ষ আলোচ্য ক্ষেত্রে তাও রয়েছে। সংলাপ নাটকের অপর উপাদান যা নাট্য ঘটনাকে প্রাগ্রসর করে। গারোদের নৃত্যে সংলাপের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। আর রয়েছে আখ্যানের ভাবগত সত্য। সর্বোপরি গারোদের নৃত্য তাদের জীবনেরই অভিজ্ঞান এবং কৃত্য সংবলিত শিল্পপ্রকরণ। বিষয়গত গুরুত্ব অনুযায়ী গারোদের কৃত্যমূলক নাট্যের আলোচনায় নৃত্য একই পঙক্তিতে বসবার যোগ্য। আদিম গোষ্ঠীতন্ত্রে বিশ্বাস এবং জগৎ সৃষ্টির কারণ সংবলিত পুরাণের প্রতি প্রবল আস্থা অলৌকিক বিশ্বাস গারোদের মধ্যে প্রবল। কার্যকারণ সূত্রে কোনো ঘটনার সূত্রপাত ঘটে এমন ভাবনা তাদের অস্তিত্বে নেই। যে কোনো কাজের পেছনে পেছনেই অনুসন্ধান করে কোনো না কোনো দৈবশক্তির অস্তিত্ব। এ জন্যই তাদের দেবদেবীর সংখ্যার শেষ নাই। গারোদের স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টিরহস্য বিষয়ক পুরাণ রয়েছে। সেই পুরাণের আদলেই তারা নৃত্য সৃষ্টিরও এক পুরাণ কল্পনা করেছে। সেই পুরাণের প্রেক্ষাপটেই তাদের নৃত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে—

গারোদের নৃত্যবিষয়ক পুরাণ :
কাহিনির বর্তমান রূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—
'পাতালপুরীর আধো আলো, আধো অন্ধকারে নিজের পেটটাকে ঢাকের মতো বাজিয়ে 'সিসি থাপ্পা' মুখে বাঁশির সুর তুলে নাঃ সুদেঙ্গা, স্থূলদেহী 'ফক্কারন্দা' ও পায়ে খাটো 'দালিং' বিবস্ত্র অবস্থায় নেচে গেয়ে দিন-মাস-বৎসর ভুলে আমোদ ফুর্তিতে রত ছিল। একদিন 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা (পান কৌড়ি) বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্রের সাত তরফ গভীর তলদেশ পার হয়ে সেই আনন্দলোকে উপস্থিত হলো। শরীর দুলিয়ে নাচের তালের সঙ্গে সেও হাতের তাল দিতে থাকে। এক সময় 'সিসি থাপ্পা' নাচতে নাচতে তাকে দলে টেনে নিল। আত্মবিস্মৃত 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা' তারে তালে নাচতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই 'সিসি থাপ্পা' 'ফক্কারন্দা' 'দালিং' সকলের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। অনেক দিন পর হঠাৎ একদিন তার দেশের কথা মনে হলো। সবুজ বনানী ও নীল আকাশের মোহন মায়ায় অন্যমনষ্ক 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা' নাচের তালে ভুল করে। উপস্থিত সকলে চিন্তিত হয়ে পড়ে। বন্ধুরা তার শারীরিক সুস্থতা বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়। অবশেষে সে বিদায় গ্রহণ করে। 'সিসি-থাপ্পা' অশ্রুসজল চোখে বলে-

'আবার এসো। আমার বাঁশীর সুর মনে রেখ।'
'না : সুদেঙ্গা' দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে একটি বাঁশি 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা'র হাতে তুলে দেয়। 'ফক্কা-রন্দা' ও 'দালিং' তাকে জড়িয়ে ধরে আবেগ গদগদ চিত্তে বলে : 'নাচের তাল আর মুদ্রা মনে আছে তো?'
নিজ দেশে ফিরে এসে 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা' 'ওয়াংমিথং' বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত জলাভূমির কাছে সকাল-সন্ধ্যায় নাচের 'তাল' অনুশীলন করতো। ডানা মেলে, কখনো তা গুটিয়ে, কখনো ডানা ঝাপটে-তালে তালে, সামনে-পিছনে অগ্রসর হয়ে মনের আনন্দে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, নেচে-গেয়ে বেড়াতে লাগলো। তার আনন্দ ঢেউ-এ জলাভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছুঁয়ে যায় সোনালি রোদের ঠোঁটে ঝিক্‌মিক্ করতে করতে।

একদিন 'আৎছু দুঃ ছেংফা'ও 'খামছেদুংফা' দু'ভাই ওয়াংমিথং বাজারে আদা বিক্রি করতে আসে।
জলার ধারে আসতেই 'দুঃ ছেংফা' বললো :
ঃ 'হেই সামনে দেখছিস?
ঃ তাই তো! থাম ভাল করে দেখে নিই।
ঃ আমার ঝুড়িটা নামালাম।
ঃ তাহলে আমিও জিরিয়ে নিই।
ঃ 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা', তুমি কি করছো?
ঃ দেখছ না আমি নাচ্‌ছি, যার মনে আনন্দ থাকে সে-ই নাচে।
ঃ তুমি কোথা থেকে এই নাচ শিখলে?
ঃ শিখেছি এক জায়গা থেকে। আহা, কী সুন্দর সেই দেশ!
ঃ সেই জায়গার নাম আমাদের বলবে?
ঃ বললেও কোনো লাভ নেই।
ঃ কেন?
ঃ বড় বিপদসঙ্কুল সেই পথ। কতো দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেত, হাঙ্গর, কুমির গিলে খাবার জন্য বসে আছে। বাদ দাও সেই মতলব, তার চেয়ে এই ভালো (মুখে বাঁশির সুর তুলে সে নাচতে থাকে।)
ঃ লক্ষ্মী, সোনা-মানিক, 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা' বলে দাও না, আমরা শুধু একটিবার দেখে আসব।
ঃ বিরক্ত করো না।

এই বলে সে লম্বা লাফ দিয়ে নাচ শেষ করে এবং চোখের পলকে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ তার অপেক্ষায় থেকে এক সময় দুই ভাই মনের দুঃখে চলে গেলো। রাস্তায়, হাটবাজার করার মুহূর্তে এবং বাড়ি ফিরে এসেও তারা ঐ এক বিষয়েই আলোচনা করলো। এবং সিদ্ধান্ত নিলো যে, যে করেই হোক সেই পথের সন্ধান জেনে নিতেই হবে।
পরের সপ্তাহে দু'ভাই পুনরায় পথে বের হল এবং 'ওয়াংমিথং' বাজারের নিকটবর্তী হয়ে দেখলো— 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা' আরও পাঁচ সঙ্গীসহ এক জমজমাট নাচের আসর বসিয়েছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! নাচের তালে তালে তাদের সুঠাম দেহ অপূর্ব ছন্দে দুলছে। হ্রদ, পর্বত ও উদীয়মান সূর্যের প্রেক্ষাপটে নৃত্যের প্রতিটি মুদ্রার জীবন্ত ছবি তাদের মনে মুদ্রিত হয়ে রইলো।
নাচের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ 'আৎছু দুঃছেংফা' ও 'খামছে দুংফাৎ দুই ভাই পিঠ থেকে ঝুড়ি নামিয়ে নানা স্তোক বাক্যে উপাচারে 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা'র তুষ্টি সাধনে তৎপর হলো এভাবে তার সন্তুষ্টি লাভের পর 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা' একদিন সেই পাতালপুরীর রাস্তার সন্ধান দিল।
অতপর 'দুঃছেংফা' ও 'খামছে দুংফা' পাতালের নানান বিপদসঙ্কুল পথ বহু কষ্টে পার হয়ে সেই আনন্দলোকে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে তখন ধূপধুনা জ্বালিয়ে 'গোরী' নাচের মহড়া চলছে। দুই ভাই পাতালপুরীর সেই আনন্দলোকে কতদিন অবস্থান করেছিল তার সঠিক হিসাব নেই। নাচের তাল, লয়, মুদ্রা সঠিকভাবে আয়ত্ব করে দীর্ঘদিন পর তারা দেশে ফিরে এলো। নাচ পরিবেশনের জন্য প্রথমেই তারা প্রয়োজনবোধ করল বাদ্যযন্ত্রের। ফলে তারা বাঁশের চোঙার দুই প্রান্তে 'দাঃমিলজাংআ' গাছের পাতা লাগিয়ে 'সিথ্রি' লতা দিয়ে টানটান করে বেঁধে নিল। দুই হাতে চোঙার দুই প্রান্ত বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে পাতা ফেটে গেল। নানান গাছের পাতা, ছাল এবং হরেক রকমের জিনিস লাগিয়ে পরীক্ষা করা হল কিন্তু কোনোটাই প্রয়োজন উপযোগী হলো না। সবশেষে 'বলাগিপক' গাছ কেটে সেটা খোদাই করে গরুর চামড়া দিয়ে ছাওয়া হলো। অতপর সেটা বাজালে এমন সুন্দর আওয়াজ হল যে, সালছাপা, মংজিমফা, আফফা সুসিমি, খুরিগিপা, মেলাদমফা সকলে খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে নাচতে আরম্ভ করল। বাদ্যের তালে 'মিসি সালজং' প্রথমে 'গোরী' নাচ দেখালেন। এইভাবে পৃথিবীতে ওয়ানগালার সময়ে খ্রাম বাজিয়ে গোরী নাচের প্রচলন হলো।'
আশ্চর্য গারোদের আখ্যান নির্মাণ কৌশল। নৃত্য সৃষ্টির ইতিহাস একটি পুরাণের আদলে উপস্থাপন করেছে যাতে পুরাণপ্রিয় জনগোষ্ঠী অতি সহজেই তা বিশ্বাস করে। শুধু তাই নয়, স্বসৃষ্ট পুরাণের রচয়িতা সুকৌশলে একটি দ্বান্দ্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রগুলোকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেন। রহস্যময়তা, উৎকণ্ঠা আছে এতে, রয়েছে নাটকীয় উৎকণ্ঠার আভাস এবং কৌতূহল। 'আৎছু দুঃছেংফা', 'খামছেদুংফা', 'ফক্কা-রাজা-ছেংসা-নক্‌মা', 'সিসিথাপ্পা, 'ফক্কারন্দা', দালিং চরিত্রগুলো প্রখর সচেতনতার সঙ্গে সৃষ্ট। দুঃছেংফা, খামছেদুংফা পাতালে গিয়ে পাতালপুরীতে ধূপ-ধুলার আলো আঁধারিতে 'গৌরী', নাচের মহড়া প্রত্যক্ষ করে। যদি সমগ্র আখ্যানকে একটি নাটকের বৃত্তরূপে বিচার করা হয় তবে পাতালপুরীর নাট্যাংশে 'গৌরী নাচের মহড়া নাটকের অভ্যন্তরে আর এক নাটক। নাটকের অভ্যন্তরে আর এক নাটক একটি নৃ-গোষ্ঠীর কৃত্যমূলক নাট্যে নিঃসন্দেহে অভাবনীয়। বর্ণনা, সংলাপ, চরিত্র নির্মাণ কৌশল, নাটকীয় সংলাপ, জটিল আখ্যান পরিকল্পনা, নৃত্য বর্ণনা ইত্যাদি নাটকীয় গুণসমৃদ্ধ নৃত্যবিষয়ক কৃত্য যথার্থ নাট্যমূলক রচনা। এর পরিবেশনা গুণও অসাধারণ। চরিত্রগুলি স্বভাবসুলভ সরলতায় আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নাট্যিক পরিবেশ, দৃশ্য পরিকল্পনা, অভিনয় যোগ্যতা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট নাটকের গুণসম্পন্ন।
গারোদের নৃত্যবিষয়ক পুরাণের নাট্যগুণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত

প্রণিধানযোগ্য মনে করি, তার ভাষায়—

"গারো নৃ-গোষ্ঠীর নৃত্যের Rhythm টি আলোচ্য উপাখ্যানে অতি চমৎকারভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। পেটটাকে ঢাকের মতো বাজাচ্ছে সিসি থাপ্পা, নাঃ সুদেঙ্গা বাঁশিতে সুর তুলছে, নাচছে স্থূলদেহী ফক্কারন্দা ও খাটোপায়ের অধিকারী দালিং, Composition-টি অতি চমৎকার। গারো নৃ-গোষ্ঠীর নৃত্যের জন্য অপরিহার্য দুটি বাদ্যযন্ত্র খ্রাম (ঢোল) এবং বাঁশির সন্ধান মেলে এই বর্ণনায়। অন্যত্র স্থূলদেহের অধিকারী ফক্কা রন্দার নাচার প্রসঙ্গ থেকে পাই গারোদের নৃত্যের মৃদু দোলাটি। 'দা-লিং'র খাটো পায়ের নাচ নিঃসন্দেহে stepping-এর মাত্রা জ্ঞাপক। এতদ্ব্যতীত গারোদের নৃত্যের প্রকৃতিটি (Nature) সহজেই ধরা পড়ে পানকৌড়ির নৃত্যানুশীলন মুহূর্তে। সে কখনো ডানা মেলে, কখনো গুটিয়ে, কখনো ডানা ঝাপটে, সামনে-পিছনে অগ্রসর হয়ে নাচছে। গারোদের ওয়ানগালা নৃত্যে এ ঢঙটিই প্রত্যক্ষ করা যায়। সারিবদ্ধ নারী-পুরুষ খ্রাম এবং বাঁশির তালে কখনও দুই হাত প্রসারিত, কখনও ঊর্ধ্বে উত্থিত অবস্থায় কখনো তা গুটিয়ে নিয়ে আসে কোমরে। পা চলতে থাকে বাদ্যের তালে তালে— সামনে পিছনে অগ্রসর হয় তাল ঠিক রেখে। কখনো দোলে দেহের দুই পাশে। ঠিক অনুশীলনরত পানকৌড়িটির মতো।

পুরাণ কাহিনিটির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আরো গভীরতর সত্য। গারোদের নৃত্য শ্রমের সঙ্গে অম্বয় বিশিষ্ট। 'ঝুড়ি' নামিয়ে দুঃছেঙফা এবং খামছেদুংফার পানকৌড়ির নাচ দেখার ঘটনার মধ্যেই তার সত্যতা নিহিত। কারণ শ্রমার্জিত উৎপন্ন বাজারে বিক্রয়ার্থ গমন মুহূর্তে তারা এই অনিন্দ্য নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে কাঁধের ঝুড়ি নামায়। অর্থাৎ শ্রমে নিরত অবস্থায়ই তারা নৃত্য শিল্প আবিষ্কার করে, কোনো অলস অবসরে নয়। আমরা উলেখ করেছি শ্রম এবং আনন্দের উৎসরূপেই গারো সমাজ নৃত্য চর্চা করে। পানকৌড়ির উক্তির মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। 'যার মনে আনন্দ থাকে সেই নাচে'— পানকৌড়ির আলোচ্য উক্তি থেকে এ সত্যটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নৃত্য বা নাচ যে প্রত্যক্ষ করে সে আনন্দ লাভ করে— কিন্তু যে নাচে সেও মনের আনন্দেই নাচে। অর্থাৎ নাচ আনন্দের উৎস— সেই সঙ্গে তা শ্রমেরও সহায়ক। পানকৌড়ির অতি সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে দিয়ে গারো নৃ-গোষ্ঠীর গভীর বিশ্বাসজাত একটি 'Ethinic truth' অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।" সুতরাং উপরোক্ত পুরাণ কাহিনির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, গারো নৃ-গোষ্ঠীর যে কোনো নৃত্যই নাট্যমূলক। নিম্নোদ্ধৃত আলোচনায় আমরা এই নৃ-গোষ্ঠীর নৃত্যসমূহের চরিত্র নির্ণয়ের অভিলাষী।

নৃত্য যে গারো নৃ-গোষ্ঠী জীবনে এক অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তা বলাই বাহুল্য। নিজেদের তৈরি বাদ্যযন্ত্রের তালে গারো নারী পুরুষ দেহে তরঙ্গ তুলে— তার ছোঁয়া লাগে সোমেশ্বরী কংস নদীর বুকে। গারো পাহাড়ের বৃক্ষের শিরায় শিরায় তার চিহ্ন সেই নর্তন-কম্পন রূপে মূর্ত হয়। মধ্যরাতের সুষুপ্তি ভাঙে যে সব অনুষ্ঠানে পরিবেশি নৃত্যছন্দ খ্রামের তালে সেগুলোর নাম ওয়ানগালা, পান্না, দেন-বিলসিয়া, আসংসিথান্তা, জাআক্কা, দাকগিপা, আমুয়া, আচুয়া কৃত্তা, মাংঅন্না, আকৃত্তা, রংচুগালা, আদিংখৃত্তা, নকদংগাআ ইত্যাদি। উক্ত অনুষ্ঠানে পরিবেশিত নৃত্যে উপস্থিত অসাধারণ নাট্যক্রিয়া। নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা অবশ্য করণীয় ঐসব ক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ ভাবে প্রকাশ পায় বিভিন্ন ভাব, ভঙ্গি। নৃত্যমুদ্রার বৈচিত্র্য অপেক্ষা বিষয়ের বৈচিত্র্য অবশ্য স্মরণীয়। কোনো শাস্ত্র অনুসারী না হয়েও গারোদের নৃত্য ও সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। সামাজিক জীবনের কোনো একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক এই সকল নৃত্যের বক্তব্য দেহগত ছন্দ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রেই গারোদের নৃত্য নাট্যের অনেকটাই নিকটবর্তী। এতদসম্পর্কে বিশেষজ্ঞের বক্তব্য নিম্নরুপ—'নাটকে অভিনেতা অভিনেত্রীর আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্তিক অভিনয় দর্শককে দর্শনগত এবং শ্রুতিগত আনন্দ দেয় বটে কিন্তু সেটিই নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকটি সুলিখিত শিল্প সার্থক নাটকের মৌল উদ্দেশ্য দর্শকের চেতনায় একটি সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শন পৌছে দেয়া। এবং জীবনের সেই মহৎ বাণীটিকে সকল শ্রেণির দর্শকের বোধের উপযোগী করে উপস্থাপন করার জন্য আবশ্যক হয় মঞ্চায়নের। অভিনয়, পাত্র-পাত্রী, দর্শক, মঞ্চ কার্যত সেই উদ্দেশ্যকেই সার্থক করে তোলে। পোশাক এবং অঙ্গ রচনা সেক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। নাটকের গুণসম্পন্ন উক্ত নৃত্য পরিপূর্ণ অর্থে নাটক নয় বটে কিন্তু নাট্যমূলক। কারণ এগুলো Imitation of action একই সঙ্গে 'Repeated action' অর্থাৎ Ritual. কারণ প্রতিবার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে অপরিবর্তিত ভঙ্গিতে এই নৃত্য পরিবেশিত হয় এবং বাস্তব জীবনের অনুকৃতি এর উপজীব্য। মর্ত্যমানব-মানবীর জীবনভিত্তিক এইসব

নৃত্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হলো—"The dance figures are stylized pantomimes of everyday activites. In one girls pretend to cutoff their heads, letting them flop to one side in imitation of cutting down a tree. In another, a girl dances with a boy and then moves to a second in a way suggesting that she has been stolen away by a new lover and infact such boy and girl teasing is in element expressed in many of dances.'

একই মাহারীভুক্ত নর-নারীর প্রেম ও বিয়ে গারো সমাজে নিষিদ্ধ। তদুপরি জৈবধর্ম এবং সহজাত নিয়মে যদি একই মাহারীভুক্ত নর-নারী বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে তারা গর্হিত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। সমাজচ্যুত এইসব নর-নারী প্রেমকেই অধিক মূল্যবান মনে করে। তারা সমাজনীতির তোয়াক্কা না করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই বিরুদ্ধ মানসিকতা এবং প্রেমের মহিমা তারপরও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে। মঞ্চে নৃত্য শিল্পীগণ নৃত্যগীতের আশ্রয়ে এমন আখ্যান পরিবেশন করে জিকসেক্কা নৃত্যের আসরে। জিকসেক্কা নৃত্যে পরিবেশনের একটি চিত্র বিশেষজ্ঞের বর্ণনায় নিম্নের রুপ পায়—

'প্রত্যেক দলে থাকে একজন পুরুষ দলনেতা, যারা দামা সঙ্গে নিয়ে দলের মাঝখানে দাঁড়ায়। দামায় তাল দিতে দিতে একদলের পুরুষ অন্য দলের কোনো এক যুবতীর নিকট মূকাভিনয়ের ঢঙে প্রেম নিবেদন করে। যুবতী সম্মতি সূচক ঘাড় বেঁকায়— অর্থাৎ সেও প্রেম-প্রস্তাবে রাজি হওয়ার অভিনয় করে। এ পর্যায়ে প্রথম দলের পুরুষ উক্ত যুবতীটিকে হাত ধরে তার দলে নিয়ে আসার মুহূর্তে দ্বিতীয় দলের পুরুষটি বাধা প্রদান করে। এই বাধা প্রদান কার্যটি আসলে অভিনয়। অভিনয় চলে বেশ কিছুক্ষণ। অতপর দ্বিতীয় দলের পুরুষটিও পূর্বের ক্রিয়ার অনুকরণ করে এবং এই অভিনয়টিও কিছু সময় ধরে চলে। এভাবে প্রত্যেক দল থেকে মেয়ে ধরে নেয়ার কর্ম চলতে থাকে। এবং দলের সর্বশেষ মেয়েকে নিয়ে পলায়নের মুহূর্তে দলের সকল মেয়ে পুরুষ দলনেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে বাধা প্রধান করে। এই সম্মতি বাধা প্রদানের অভিনয়ও বেশ কিছু সময় ধরে পরিবেশিত হয়। অবশেষে ঐ পুরুষকে নারীহরণের অপরাধে শাস্তি প্রদান করা হয়। এরূপে দর্শককে প্রচুর আনন্দ দানের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার পলায়ন ক্রিয়ার অভিনয় 'জিক্ সেককা'।'

'জিক্ সেককা' নৃত্যে গারোদের জীবনের যে চিত্র পরিলক্ষিত হয় তা সুনির্দিষ্ট কাহিনি নৃত্য—গীত ও বাদ্যের আশ্রয়ে প্রাচ্য নাট্যরীতির ব্যাখ্যাধর্মী উপস্থাপনায় সহস্র বছর পরিবেশিত হয়ে আসছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হয়েই মঞ্চে উপস্থিত হয়। দর্শক আসরের মঞ্চে যে দুই নারী পুরুষকে প্রত্যক্ষ করে তাদের জীবনে ঘটেনি এমন একটি ঘটনানির্ভর আখ্যান উপস্থাপন করে। দর্শক বিশ্বাস করে যে, উক্ত যুবক-যুবতী একটি অসামাজিক অপরাধমূলক কাজ করেছে। যুবক নারী অপহরণের শাস্তি পেলে তারা পুলকিত হয়। এভাবেই জিক্ সেক্কা সামাজিক বাস্তবতার নাট্যমূলক নৃত্যে পরিণত হয়।

পরবর্তী আকর্ষণীয় ও শিল্পিত নাট্যমূলক নৃত্য গারোদের আন্ত্রিরুরুয়া। অরণ্যচারী গারোদের একধরনের প্রিয়ফল 'আন্ত্রি'। 'আন্ত্রিফল' কুড়াবার বিষয়কে কেন্দ্র করে যে নাচ তাই মূলত আন্ত্রিরুরুয়া। শব্দটির বাংলা অর্থ— আন্ত্রিফল সংগ্রহ। এই নৃত্যটিও আনন্দদায়ক। এতে ফল কুড়ানোর ক্রিয়াকেই পুনঃসৃষ্টি করা হয় মঞ্চে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় এ নৃত্যে একদল নারী অংশগ্রহণ করে। তাদের কেউ কেউ বৃক্ষ, বৃক্ষসমেত ডাল হয়। কেউ বৃক্ষ ও ডাল ঝাঁকায়— গাছের ডালে সপুষ্পক ফল দেখে আবার ঝাঁকায়, ফল পাড়ে। গাছের তলায় স্তরে স্তরে বিছিয়ে থাকা ফল কুড়ায়। আবার ঝাঁকায় ফল পড়ে— পড়ে থাকা ফল কুড়িয়ে কোচর ভরার অভিনয় করে। শূন্য মঞ্চকে ফল শোভিত গাছের তলা হিসেবে দর্শককে বিশ্বাস করানোর যাবতীয় কৌশল তারা প্রদর্শন করে। বাস্তবে ফল কুড়িয়ে কোচর ভরে কেউ ঘরে ফিরে না— যে পাড়ে, কুড়ায় সে ফল খায়ও। বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে অভিনেত্রীগণ ফল খাবারও অভিনয় করে। এমনিভাবে গ্রামীণ জীবনে নিত্য সংঘটিত একটি তুচ্ছ ঘটনার ভিত্তিতে গড়ে উঠা আন্ত্রিরুরুয়া নাট্যমূলক নৃত্যে গারো নৃ-গোষ্ঠীর নৃত্য বিশারদদের অনন্য পরিকল্পনা। খুব সহজেই অনুমান করা যায়, উপরোক্ত

> নাটকে অভিনেতা অভিনেত্রীর আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় দর্শককে দর্শনগত এবং শ্রুতিগত আনন্দ দেয় বটে কিন্তু সেটিই নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকটি সুলিখিত শিল্প সার্থক নাটকের মৌল উদ্দেশ্য দর্শকের চেতনায় একটি সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শন পৌঁছে দেয়া। এবং জীবনের সেই মহৎ বাণীটিকে সকল শ্রেণির দর্শকের বোধের উপযোগী করে উপস্থাপন করার জন্য আবশ্যক হয় মঞ্চায়নের। অভিনয়, পাত্র-পাত্রী, দর্শক, মঞ্চ কার্যত সেই উদ্দেশ্যকেই সার্থক করে তোলে। পোশাক এবং অঙ্গ রচনা সেক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। নাটকের গুণসম্পন্ন উক্ত নৃত্য পরিপূর্ণ অর্থে নাটক নয় বটে কিন্তু নাট্যমূলক

দুটি নৃত্য প্রকরণ বৈশিষ্ট্যগুণে পরস্পর স্বতন্ত্র। অভিনেতা অভিনেত্রীদের দক্ষতা অনুযায়ী দুটিতেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব।

গারো নৃ-গোষ্ঠীর তৃতীয় নাট্যমূলক নৃত্য— ঘোরিরআ বা ঘোড়া নৃত্য। এই নৃত্য এক সময় আচ্ছিক গারোদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো ব্যাপকভাবে। সম্ভবত গারো রাজপুরুষদের জীবনের সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক ছিল। ঘোরিরআ নৃত্য গারোদের ইতিহাসের সেই কালকে স্মরণ করিয়ে দেয় যখন গারো পাহাড় অঞ্চলে গারো রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলোচ্য নৃত্যের উপলক্ষ ছিলো যুদ্ধে নিহত পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা, তাদের অতৃপ্ত আত্মার শান্তি কামনা। সমৃদ্ধ অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা। বসন্তকালে কিংবা হেমন্তকালে এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে ঘোরিরআ পরিবেশিত হয় না তবু এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। মেয়েদের পরিবেশিত আলোচ্য নাট্যমূলক নৃত্যের পরিবেশনা রীতি নিম্নপ—

'প্রথমে বাঁশ দিয়ে একটি ঘোড়া মূর্তি নির্মাণ করা হয়। ঘোড়া মূর্তিটিকে কাপড় এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় দ্রব্য সম্ভারে অত্যন্ত চমৎকার করে সাজানো হয়। ঘোড়ার সাজ এবং অংশগ্রহণকারী নারীদের সাজে পোশাক হয় সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে সাজ-পোশাক মূলত যোদ্ধাদের। ঘোড়ার গলায় এবং নারীদের পায়ে থাকে ঘুঙ্গুর। মেয়েরা জামা পরে এবং তার ওপর ঘাড় হতে কোমর পর্যন্ত কৌণিকভাবে থাকে ফান্দ্রা। মাথায় থাকে পাগড়ি তার সঙ্গে লাগানো হয় দোনী (পাখির পালক)। পিঠে ঝোলানো থাকে ওয়াসিংয়ের মধ্যে তীর বা ব্রা। ছি বা ধনুক কখনও পিঠ কখনো থাকে হাতে। এতদ্ব্যতীত হাতে থাকে কাঠ বা বাঁশের তৈরি মিলাম, স্ফি (ঢাল তলোয়ার)। যোদ্ধার সাজে সজ্জিতা নারীগণ ঘোড়ামূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে পথে বের হয়— ঘোড়ার মূর্তি থাকে শোভাযাত্রার সম্মুখে। এই সময়ে অংশগ্রহণকারী মেয়েরা লাফ—ঝাঁপ, নাচানাচি এবং নানা রকম যুদ্ধ কৌশল দেখিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। উৎসব চলে তিন দিন তিন রাত— কোনোরূপ বিরতির সুযোগ নেই। গ্রাম প্রধান বা নকমার বাড়ি থেকেই প্রথম ঘোরিরআ আরম্ভ হয় এবং তিন দিন তিন রাত পর কোনো জলাশয়ে

ঘোড়ার সাজ-সজ্জা উন্মোচিত করে মূর্তিটিকে জলে বিসর্জন দেয়ার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে অনুষ্ঠানের।

'ঘোরিরআ'র 'Performance style' উপরোক্ত দুটি নাট্যমূলক অনুষ্ঠান থেকে ভিন্নতর। অংশ গ্রহণকারী মেয়েরা 'খেমটা' বা কাহারবা' তালে অধিকাংশ সময় নৃত্য করে। এতে তারা কার্যত দুটি সৈন্য দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ দৃশ্যের অভিনয় উপস্থাপন করে। এর জন্য তীর-ধনুক, ঢাল-তলোয়ারসহ যুদ্ধ সাজে সজ্জিত সৈনিক নারীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। এই সময় ক্রোধ এবং শক্তির স্মারক হিসেবে হাত থাকে মুষ্ঠিবদ্ধ এবং বুকের ছাতি টানটান। ক্রোধ প্রকাশের এবং আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্তে তারা মাটিতে বার বার পা ঘষে প্রথমবারের মতো কয়েক চক্কর নৃত্য প্রদর্শন করে।

এরপর মিলাম স্ফি সহযোগে আক্রমণের ঢঙে মলযুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল ও মুদ্রায় অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য ও মূকাভিনয় করে। কখনো কখনো বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে বীরদর্পে সজোরে চীৎকার ধ্বনি সৃষ্টি করে এবং হুংকারের সঙ্গে মাটিতে তলোয়ারের আঘাত করে। গারোদের এই ঘোরিরআ'র সঙ্গে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত লাঠি খেলার আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্য শুধু লাঠিখেলায় পূর্বোক্ত নিয়মে কোনো ঘোড়ার মূর্তিসহ শোভাযাত্রার প্রচলন নেই। লাঠিখেলায় অংশগ্রহণকারী অভিনেতা যোদ্ধাদের নির্দিষ্ট সাজ-পোশাক ও হস্তবাহিত সরঞ্জাম রয়েছে এবং তারা ঘোরিরআয় অংশগ্রহণকারী মেয়েদের মতোই ঘুরে ঘুরে নৃত্য সহযোগে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ ও নানা প্রকার যুদ্ধ কৌশলের মুদ্রাসহ তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে। লাঠি খেলায় বীরত্ব ব্যঞ্জক চীৎকার ছাড়াও রয়েছে সুনির্দিষ্ট 'ডাক'— যাকে আধুনিক কথায় সংলাপ বলাই শ্রেয়। স্মর্তব্য যে, সে সংলাপের অর্থ সাধারণ্যে বোধগম্য নয়— কিন্তু প্রতিপক্ষ রূপে উপস্থিত লাঠিয়ালগণের কাছে তার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই সংলাপের ভাষাকে অনুসরণ করেই পুরো ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। সম্ভবত ঘোরিরআতেও অনুরূপ কোনো সাংকেতিক ভাষার সংলাপ ছিল যার অর্থ কেবল অংশগ্রহণকারীদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব হেতু বিলুপ্ত এই নাট্যমূলক অনুষ্ঠানের সংলাপরীতি সম্পর্কে বর্তমান ক্ষেত্রে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

গারোদের ঘোরিরআ নাট্য বাংলা কসরৎ নাট্য লাঠিখেলার সঙ্গে তুল্য। কিন্তু লাঠিখেলায় অংশগ্রহণকারীগণ পেশাদার লাঠিয়াল। পক্ষান্তরে ঘোরিরআ নৃত্যে অংশগ্রহণকারীরা পেশায় যোদ্ধা নয়—মাবৃতান্ত্রিক সামন্ত সমাজের নারী। তারা প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত নাট্যমূলক নৃত্যে অভিয়নার্থে অংশগ্রহণ করে। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে আলোচ্য নৃত্যে প্রকৃত কোনো ঘোড়া ব্যবহারকরা হয় না— ঘোড়ার প্রপস হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং পুরুষের সাজ পোশাক পরিধান করে নারীরা পুরুষ সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই নৃত্যটিতে কৃত্যের উপস্থিতিও বিদ্যমান। উপরোক্ত নাচের কৃত্য অংশে ঘোড়ার সুসজ্জিত মূর্তি নিয়ে গ্রামময় পরিভ্রমণের সঙ্গে বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তির দিন সুসজ্জিত পুরুষদের শিবকাচ নৃত্যের তুলনা করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে একে মিসরীয় শস্য দেবতা ওসিরিস প্যাশন পের শোভাযাত্রার সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয়। গবেষকের বক্তব্য অনুযায়ী গারো ভাষায় ঘোরিরআ, ঘোরি রোদিলা, ঘোরিওয়াত্তা ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত। ঘোরি= ঘোড়া, র আ বা ওয়াত্তা= ছেড়ে দেয়া। অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে ঘোরিরআ অর্থ হচ্ছে ঘোড়া ছেড়ে দেয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ ঘোড়া নৃত্য। 'আচ্ছিক' গারোদের বসবাস ছিল গারো পাহাড়ের টিলায়। টিলায় বসবাসকারীদের জীবনে ঘোড়ার ব্যবহার কতো দূর গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে এটুকু বলা যায় যে, উচ্চাবচ পাহাড়ি বন্ধুর পথে ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব নয়। যতোদূর জানা যায়, গারোদের উপকথায় ঘোড়ার প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত। তবে কি পূর্বপুরুষ যোদ্ধা ছিল এ ধারণার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের যোদ্ধাদের বাহন রূপেই ঘোড়ার মূর্তি শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে? নাকি যোদ্ধা সম্প্রদায়ের প্রতীক রূপে এসেছে মূর্তিটি? সত্যিকার অর্থে এ বিষয়ে আজ আর নিশ্চিত করে কিছুই বলার উপায় নেই।

ঘোরিরআ বস্তুত যুদ্ধনৃত্য। গারোদের অপর এক যুদ্ধ নৃত্য 'গ্রীককা'। উভয় নৃত্য সাদৃশ্যপূর্ণ। আলোচ্য নৃত্যে দুজন অভিনেতা পক্ষ ও বিপক্ষরূপে 'মিলাম' অর্থাৎ তরবারী এবং 'স্ফি' অর্থাৎ ঢাল সহযোগে বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করে। একে অপরকে আক্রমণ সূচক ভঙ্গি করে এবং যুদ্ধরত যুদ্ধার ভঙ্গিতে মুখে শধর শধর শব্দ উচ্চারণ করে। এই ধ্বনি আনন্দদায়ক। একে প্রাচীন Fighting dance এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। যে নামেই চিহ্নিত করা হোক গ্রীককা নাট্যমূলক নৃত্য। এর পরিবেশনায় একটা গল্প অনুসরণ করা হয়- অভিনেতারা চারিত্রকেই উপস্থাপন করে- সেজন্য তাদের সাজ- পোশাক গ্রহণ করে এবং আচরণ করে সেই মতো। ব্যক্তিগত জীবনে সৈনিক না হয়েও তারা সৈনিকের ক্রিয়ারই অনুকরণ করে। অতএব নাট্যমূলক নৃত্য হিসেবে গ্রীককা গারোদের শিল্পচিন্তাকে ধারণ করছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।